Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৭০ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১০ই মাঘ, ১৪৩২ / 24.01.2026

- সম্পাদক -

সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

(৭০তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
আত্মকথা	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
ভক্তের ভগবান	শ্রীবীরেশ্বর প্রসাদ বক্সী
পিতৃপ্রসঙ্গ	ডঃ সুভাষ চন্দ্র শাসমল
শ্রীগৌরাঙ্গ ও সংহতি	ব্রজরাজ কিশোর গোস্বামী
মিজোরাজ্যের রাজধানী- আইজল	শ্রী অরূপকুমার ভট্টাচার্য্য
বৈষম্য	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

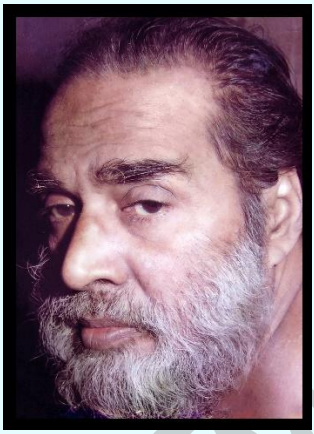

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

" ঈশ্বর আমাদের সকলের মধ্যেই রয়েছেন, তা জ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক। আমাদের মধ্যে অবস্থিত এই ঈশ্বরের জন্যই যেমন আমরা জীবন ধারণ করি, তেমনই কর্মও সম্পাদন করতে পারি - সর্বদা এই উপলব্ধি হৃদয়ে পোষণ করতে পারলে অহং থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। ঈশ্বরে শরণ নিতে হবে, আমাদের মন প্রাণ ইন্দ্রিয় হৃদয় বুদ্ধি ইচ্ছা ও কর্ম নিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে হবে। তাহলে তখন আমাদের ভিতর ভাগবৎ প্রেম ও জ্যোতি নেমে আসবে।"

আত্ম-কথা **শুক্লা ঘোষ**

এই সংখ্যাটি পার্থসারথির নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা (আষাঢ়, ১৪০১)। এবার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাই প্রকাশিত হল অপ্রত্যাশিত দেরীতে। শ্রীপ্রীতিকুমারের জীবনে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। বই মুদ্রিত হতে একটু দেরী হলে পাগল হয়ে যেতেন। কতদিন দেখেছি "বসাক ট্রেডিং কোং" প্রেসে দু'বেলা বসে থাকতে। নিজে শ্যামবাজারে বসে প্যাকিং করতেন। আসা যাওয়ার পথে কতদিন দেখেছি টানা রিক্সা করে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে চলেছেন। মুখ দেখে মনে হত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করতে যাচ্ছেন। যদি কোথাও একা যেতেন, রাস্তার মাঝে আমাদের দেখলেও কথা বলতেন না। আমিও বেশ রীতিমত অভ্যস্ত ভাবে কোনও কথা না বলে পাশ দিয়ে চলে যেতাম। আসলে আমাদের ভীষণ নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলতে শিখিয়ে ছিলেন। আমরা সারাজীবন রান্নাঘরে সময় কাটাই নি, শুধু পড়াশোনা করে সময় কাটাই নি, শুধু আড্ডা মেরে সময় কাটাই নি, যে কোনও কাজ সময় মতো সেরে নিতাম।

হ্যাঁ! বলছিলাম পার্থসারথির কথা। শ্রীপ্রীতিকুমারের সময়ে পার্থসারথি কখনও দেরীতে প্রকাশিত হয় নি। আজকাল মাঝে মাঝে দেরীতে মুদ্রিত হচ্ছে। আসল ব্যাপারটা হল যারা প্রেসের মালিক তাদের পয়সার অভাব নেই। মনে হয় সখের জন্য প্রেসটা চালান। কাজ হল বা না হল, কর্মচারী থাকল বা না থাকল – তাদের মাথা ব্যথার কোন ব্যাপার নেই। আবার টাকা পয়সার জন্যও কখনও আমার কাছে তাগাদা দেননা। এবার আমি এপ্রিল মাসের স্যালারি মে মাস শেষ হয়ে গেলেও না পেয়ে প্রেসে টাকা দিতে পারিনি। আমার মনে হয় না সে জন্য বইটা দেরীতে দিলেন। একবার জিজ্ঞেস করে দেখবো না হয় এমন কেনো হল! যাইহোক পাঠকবর্গের কাছে বইটা দেরীতে পৌছোবার জন্য আমার দুঃখ স্বীকার করা উচিতই। শুনেছি আষাঢ় সংখ্যা সামনের সপ্তাহেই বেরোচ্ছে। ম্যাটার যদি আগে প্রেসে পৌঁছে দিতে পারতাম, তাহলে এক বছরের পার্থসারথি নাকি এখনই ছাপা হয়ে যেতো। কারণ ওরা নাকি এবার "পার্থসারথি" খুব সিরিয়াসলি ধরেছেন।

বাচেন্দ্রী আমার সময়টুকু মোটামুটি দখল করে রেখেছেন। বাড়ী থাকলে আমার সময় তাকে নিয়ে কেটে যায়। মাত্র ছ' মাস বয়সের অমন ধুরন্ধর মেয়ে আমি দেখিনি। ভাইঝিদের বড় করেছি, নিজের ছেলেকে বড় করেছি, কৌশিককেও করেছি। দু'টি নাতি নাতনীকেও কিছুদিন সেবা করেছি। কিন্তু তারা কেউ এই মহিলার মতো ছিল না। অদ্ভুতভাবে time maintain করে। খাবার সময়ে ঠিক ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমাবার সময় কারও সাথে কোনও compromise করে না। তিনি প্রায় একমাস হল রাত্রে আমার কাছে ঘুমোচ্ছেন। রাত্রে হঠাৎ কেঁদে উঠলেন। জল চাই না, কিছু চাই না, শুধু কোলে নিয়ে বসে থাকতে হবে। মতলব না হলে শোবে না। আমার অভিধানে "পারিব না" বলে কোনও শব্দ নেই। তাই তিনি দয়া না করা পর্যন্ত কোলে নিয়েই বসে থাকি। আমিই বাসী কাপড়ে বাচ্চার খাবার করিনা, করতে দিই না। এখন ভোর চারটের সময় উঠেই স্নান সেরে নিই বাচেন্দ্রীর খাবার দেবার জন্য। ফলে আমার সাতটি শিব আজকাল আর গঙ্গাজলে স্নান করেন না। ট্রে করে তাঁদের একদম shower-এর নীচে এনে স্নান করিয়ে দিই। উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলার পর আমি আর গঙ্গাস্নান করি নি। তাই আমার শিব ঠাকুরও বাড়ির ট্যাঙ্কের জলে স্নান করেন। আসলে পূজা অর্চনার সেই ঝোঁক আর নেই।

শ্রীলা 'বাচেন্দ্রী' নামটির উপর খুব আগ্রহ দেখায় নি। অনেকেরই খুব খটোমটো লেগেছে। তাই ভালো নামটি ঠিক করে দিলাম – "প্রচেতা"। এর আগে শ্রীপ্রীতিকুমারের বাবা, ঠাকুরদা, ভাইদের সব নামের আদ্যাক্ষর ছিল 'প্র' দিয়ে। আমার পুত্রের নাম ছিল 'পার্থসারথি'। পত্রিকার জন্য আমি 'পার্থসারথি' নামটি বাতিল করে দিয়ে নাম রেখেছিলাম – 'পার্থসখা'। শ্রীপ্রীতিকুমার পুরুষকারে বিশ্বাস করতেন, ছেলের নামের সঙ্গে 'সখা' শব্দটি পছন্দ করেন নি। আমি শেষ পর্যন্ত ছেলের নাম রেখেছিলাম 'সুনন্দন'। এবার বাচেন্দ্রীকে শ্রীপ্রীতিকুমার চাক্ষুষ দেখেন নি, তাই আমি আবার 'প্র' আদ্যাক্ষরে পৌঁছে গেলাম।

শেষ খবর হচ্ছে – '৮৮ সালে বৌবাজারে আমাদের নিদারুণ ভাবে নিগৃহীত

করার ফলে প্রতিপক্ষের সাথে যে case, counter case-এর পালা চলছিল বিপক্ষ থেকে গত ডিসেম্বর মাসে তার compromise petition জমা পড়েছিল। নানা আইনী মারপ্যাঁচ এবং টালবাহানার পর অবশেষে এই মাসে মামলা দুটি খারিজ হয়ে গেছে। গত পাঁচ বছর ধরে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে attend করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। কত রকমের লোকের আসামীর ওখানে আনাগোনা। ছেলের কল্যাণে আমার সব কোর্টগুলিই দেখা হয়ে গেল। মারার পর আমাদের প্রতিপক্ষ যে counter case করেছিলেন তা শুধু আমার আর বাপীর বিরুদ্ধেই নয়, নীরেনদা, অনু, কিশোর সবাইকেই জড়িয়ে।

আমার হয়েছিল মহা মুস্কিল। যারা আমাদের সময়ে অসময়ে অত সহায়তা করেন, তাদের যদি কেউ বিপদে ফেলে খুব করুণ অবস্থা হয়। মরমে মরে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল আমার শত্রুরা যেন আমার পরামর্শ নিয়েই সকলের নামে case করেছে। তারাই আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই case withdraw করলো। আমার দায় ফুরোলো। আর আমার কারও কাছে মাথা নীচু করে থাকতে হবে না। সমস্ত case-টি আমি এবার শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছি। তিনি বলেছিলেন গীতাদিকে – "আমার স্ত্রী পুত্রকে কেউ অপমান করলে বা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করব না।" সেই অসহনীয় অবস্থাটা কবে কিভাবে সৃষ্ট হবে সেটা আমি দেখে যেতে পারব কিনা সেটাই জানি না।

অনেক দিন চিঠি পত্র লেখা হয় না। শ্রীমতী স্মিতা চৌধুরীর মাতৃবিয়োগে আমি খুবই দুঃখিত। তাঁকে সমবেদনা জানাবার উপযুক্ত ভাষা আমার নেই। তাঁর মায়ের আত্মার শান্তি কামনা করি।

কটকের মঞ্জুদির কোনও খবর নেই। আমার উপর খুব রাগ করেছেন। আমি অতি অবশ্য ক্ষমাপ্রার্থী। জানি না কবে তাঁর সাথে দেখা হবে। কলকাতায় এলে দেখা করতে গেছিলাম, তিনি ছিলেন না। আর তাঁর কোনও খবর পাই নি। জানি না কবে দেখা হবে।

তারাপীঠে দু'দিন চেষ্টা করেও যেতে পারিনি। ভোরবেলায় ঘুম না ভাঙ্গায় ট্রেন ধরতে পারিনি।

একটি জায়গায় দু'বার গেলাম। তারকেশ্বর। শ্রীপ্রীতিকুমার তিনটি স্থানে খুব নিয়মিত যেতেন। তারাপীঠ, পুরী ও তারকেশ্বর। প্রতি বছর দু'বার করে দর্শন হত। তিনি প্রয়াত হবার পর তারকেশ্বর আর যাওয়া হচ্ছিল না। এপ্রিল মাসে বাপী নিয়ে গেছিল। আবার মে মাসে কিশোরের সাথে গেছিলাম। একটা জিনিস বুঝতে পারলাম বাবা তারকনাথ কারও চেয়ে কম যান না। মনস্কামনা পূরণ করতে তিনিও কম যান না।

গত বছর operation-এর জন্য পুরী যাওয়া হয়নি। এবার রথে যাওয়া হল না। আমাদের মহারাজ তীর্থস্থানে যাবার পক্ষে একেবারেই মত দেন না। তা সত্ত্বেও পুরীধামে যাবার chance একবার নেবই। অনেকদিন পরপর একটু ঘুরে না এলে মনটা যেন উধাও হয়ে যেতে চায়। তাই এবার ঠিক করেছি একদিনের জন্য হলেও রথের রশিতে হাত দিতে যাবই। এবার অবশ্য আমার সঙ্গী বাচেন্দ্রী।

- - - - - - - -

(** রচনাকাল – জুন, ১৯৯৩)

"যেখানে সংগ্রাম নাই, সেখানে সাধনাও নাই। ভিতর ও বাহিরের বিরুদ্ধ ভাবের সহিত সংগ্রামের ভিতর দিয়াই সাধক প্রতিনিয়ত শক্তিমান হইয়া উঠে।

- স্বামী প্রণবানন্দ

সুদামা শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ক্রীড়া সঙ্গী। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন মথুরা নগরীতে। হয়েছেন মথুরাধিপতি।

নন্দপুর চন্দ্রবিনা বৃন্দাবন আজ অন্ধকার। বৃন্দাবনে বাজে না আর সেই সর্ব্বভূত মনোহর বাঁশী, নাই গান নাই হাসি। তাই সুদামা ও অন্যান্য গোপবালক গণের অশ্রুসজল আঁখি।

ব্রজবিহারী ব্রজধামে থাকাকালীন সুদামা ও গোপবালকগণ তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনের গোচারণ মাঠে, যমুনা পুলিনে, এমন কি হাস্যোচ্ছলা কলনাদিনী যমুনায়ও কত খেলাই যে খেলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সখারা কৃষ্ণকে কাঁধে করে নিয়ে বেড়িয়েছেন। যে বনফলটি খেয়ে নিজেদের মিষ্ট লেগেছে, সেটি অর্দ্ধভুক্ত করে সখার মুখে গুঁজে দিয়েছেন। উচ্ছিষ্ট জ্ঞান নেই, সম্ভ্রম বোধও নেই। কী অপূর্ব! সখাদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে যিনি স্বয়ং ভগবান তাঁহারও কত তৃপ্তি। বার বার চেয়ে খেয়েছেন। ভক্ত ও ভগবানের অপূর্ব্ব ঐকান্তিকতা ! ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সখ্য সম্বন্ধ – বাধাহীন, সঙ্কোচহীন, দূরত্বহীন। কারণ অনেক পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভাই, ভগিনীকে, পুত্র কন্যাকে যা বলা যায় না, অসঙ্কোচে সখাকে বলা যায়। তাই তো ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সখ্য সম্বন্ধ কত মধুর - মধুরং মধুরং মধুরং।

শ্রী ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়ারত সুদামা ও তাহার সঙ্গীগণের মানবজীবন হয়েছে সার্থক ও ধন্য। কী সৌভাগ্য তাঁদের!

বৃন্দাবন বিহারী ব্রজেশ্বর প্রত্যেকের হৃদিবৃন্দাবনে চির অধিষ্ঠিত। তাঁহার সঙ্গে ক্রীড়ারত হবার জন্য মুনি ঋষি, সাধু সজ্জনের আকাঙ্খার অন্ত নেই। তাঁরা বৃন্দাবন বিহারীর সঙ্গে ক্রীড়ায় লিপ্ত হবার নিমিত্ত সদাই লুব্ধ। জন্মজন্মান্তরের কত অক্লান্ত সাধনার ফলে এই সৌভাগ্য অর্জ্জিত হয়।

তাই বলছি সুদামা ও অন্যান্য গোপবালকগণের কত সৌভাগ্য ! পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে বিনা সাধনায় শ্রীভগবানের সঙ্গে ক্রীড়ায় তাঁদের দুর্লভ মানব জীবনের চরম সার্থকতা।

ভগবানের সঙ্গে ভক্ত অভিন্নাত্মা। ভক্ত বহির্বস্তু নয়। ভক্ত ও ভগবানের হৃদয় এক তারে বাঁধা, একই সুরে ঝঙ্কৃত। একই সূত্রে গাঁথা (সূত্রে মুনিগণা ইবঃ - গীঃ)। ভক্তের যা কিছু আনন্দ-বেদনা, কামনা বাসনা-তৃষ্ণা, সবই ভগবানকে কেন্দ্র করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রী ভগবান বললেন-

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ত্ত্বহম্।
মদন্যেত ন জ্ঞানন্তি নাহং তেভ্যমনাগণি।।

ভক্তের হৃদয় আমার। আমার হৃদয় ভক্তের। ভক্তেরা আমাকে ছাড়া অপর কিছু জানে না, আমিও তাদের ব্যতীত অন্য কিছু জানি না। ভগবান আত্মারাম। তাঁর সম্ভোগ নিমিত্ত বহির্বস্তুর প্রয়োজন নেই। তাই আপনি দুই হলেন, সৃষ্টি করলেন ভক্তকে। কারণ "স একাকী ন রম্যতে"। একা একা আনন্দ পাওয়া যায় না, ভক্তের মাধ্যমেই তাঁর পূর্ণতা ও আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে ভাবে চরম এক আনন্দে উৎসুক, "আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ।"

সুদামার বাসস্থান বৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখারূপে তাঁর সাধারণ পরিচিতি। কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় তিনি পরম ভাগবত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণে তিনি অনুরক্ত ও তাঁর জীবন সমর্পিত।

অহেতুক প্রীতির বন্ধনে সুদামা ও সখা শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাধাহীন আবার ভক্তও শ্রীভগবানের অধীন। শ্রীভগবানের অধীনতাই ভক্তের স্বাধীনতা। ভক্ত ভক্তি দ্বারা ভগবানের অধীন ও তদংশীভূত হয়ে থাকতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করেন, ভগবানও ভক্তের প্রেমের অধীন ভক্তের দাস হতে চান। কিন্তু চাই প্রয়াস। ভক্তের প্রয়াস দেখে ভগবান কৃপাবশতঃ তাঁহার প্রেম বন্ধনে বদ্ধ হয়ে পড়েন, যেমন বৃন্দাবন ত্যাগ করে চলে যাবার পরও অন্তর্যামী রূপে, সুদামার তাঁকে পাবার প্রয়াস দেখে;

তিনি আরও দৃঢ়তররূপে প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর বাল্য সখার সঙ্গে। "দৃষ্ট্যা পরিশ্রম্ কৃষ্ণঃ কৃপাসীৎ স্ববন্ধনে।"

শ্রীভগবানে অহৈতুক ভক্তি তাঁকে আপন করে নেবার প্রকৃষ্ট পন্থা। এই দুঃখময় স্বার্থপরতা কলুষিত জগতে সকল জীবের অন্তরে সকল মানবের অন্তরে এক অপূর্ব রত্ন লুক্কায়িত আছে, তার নাম প্রীতি বা প্রেম ভালবাসিবার শক্তি। এই প্রীত্যাত্মক শক্তির নামই ভক্তি। ইহাকে সচ্চিদানন্দ ভগবানের স্বরূপ শক্তি বলা হয়। ভক্তি চন্দন মিশ্রিত করে শুধু পূজার্ঘ্য নয় ভক্ত তাঁর যা কিছু, কর্ম প্রবৃত্তি সব ভগবানের চরণে ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণ – সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের চরণে নিবেদন করেন, ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের সেইসব ভক্তিচন্দনে মিশ্রিত দান সানন্দে গ্রহণ করেন। শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত উপহার তা যতই সামান্য হোক না কেন, গ্রহণ না করে থাকতে পারেন না, যেমন গ্রহণ করেছিলেন সুদামা প্রদত্ত খুদের নাড়ু। "তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি"(গী - ৯/২৬)। ভক্তিযোগী পুরুষ অনন্য চিত্তে নিয়তই "তাঁকে" স্মরণ করেন। অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা সেবা করেন তাঁর।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণাম্।। (ব্রহ্মসংহিতা ৫/১)

এই অখিল রসাসৃত সচ্চিদানন্দ সর্ব্বকারণের কারণ শ্রীগোবিন্দ ভক্তিদ্বার লভ্য। ভক্তির সার হচ্চে প্রেম। সুতরাং প্রেমার্ঘ্যেই সম্পাদিত হয় শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ পূজা। ভক্তি দেবীর ক্রোড়েই ভক্ত ও ভগবানের চিরন্তন ক্রীড়া।

"ভক্তিপ্রিয়ঃ সবিবঃ" ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ (গীঃ ১২/২০)। ভক্তগণই আমার অতীব প্রিয়।

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতি শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনম্ লোকরঞ্জনম্।। (ভাগবত-৭/৯/১০)

ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির জাতি-গৌরব, শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, জপতপ সবই প্রেমহীন ব্যক্তির ভূষণের ন্যায় নিরর্থক।

নারদ তদীয় ভক্তিসূত্রে বলেছেন– পরাভক্তিই অমৃতস্বরূপ, উহার প্রাপ্তিতে সাধক সিদ্ধ হন, অমর হন, তৃপ্ত হন।

সা তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা অমৃতস্বরূপাচ। যল্লব্ধা পুমান সিদ্ধো ভবত্য মৃত ভবতি তৃপ্ত ভবতি। যৎ প্রাপ্য কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি। পরাভক্তির অধিকারী হলে সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, শোক তাপ হিংসা দ্বেষ উবিয়া যায়।

সুদামার জীবন উপরিউক্ত ভক্তির ভাবধারায় ছিল সমুজ্জ্বল। ভগবানকে আপন করে নিয়েছিলেন তিনি প্রেমের দ্বারা, ভক্তাপরাধী ভগবানও সেই একই প্রেমের দ্বারা অর্থাৎ তাঁহার প্রীত্যাত্মক স্বরূপ শক্তির দ্বারা, সুদামাকে আপন করে নিয়েছিলেন।

ব্রজবিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন মথুরা নগরীতে। কিন্তু সুদামার হৃদয় বৃন্দাবনে তিনি চির জাগ্রত। সুদামা ও তাঁর স্ত্রী তাঁরই অনুকথনে ও অনুস্মরণে সদাই মগ্ন। তাঁর লীলা প্রসঙ্গ স্বামী স্ত্রীর জীবনে একমাত্র সান্ত্বনা ও তৃপ্তি। তাঁরা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করে তাঁর বিরহে সন্তপ্ত হওয়া সত্ত্বেও পরম সন্তোষ ও পরম প্রেমানন্দ উপভোগ করতেন। "মচ্চিত্তা মদগত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি রমন্তি চ" (গী- ১০/৯)। শ্রীগোবিন্দের ভজনা, তাঁর নাম কীর্ত্তন ভক্তিপূর্বক তাঁকে নমস্কার, এই তখন তাঁদের জীবনের লক্ষ্য। সতত যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রত হয়ে তাঁর সঙ্গ লাভের জন্য আরও বেশী উদ্যমশীল। "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা" (গী- ৯/১৪)

তবুও আজ বাল্য সখাকে চাক্ষুষ দর্শন করবার প্রবল আগ্রহ জেগেছে সুদামার পিপাসার্ত অন্তরে, কারণ এ পিপাসার নিবৃত্তি নেই, যতই সঙ্গ ততই পিপাসা।

গরীব তিনি, কোনও প্রকারে দিন গুজরান হয়। তিনি তাঁর সখার জন্য, শুধু সখা নয় তাঁর জীবন সর্ব্বস্বের জন্য, কি নিয়ে যাবেন? মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ঘরে শুধু ক্ষুদ আছে আর কিছুই নেই। বললেন তাঁর স্ত্রীকে কয়েকটি ক্ষুদের নাড়ু

প্রস্তুত করে দিতে। তাঁহার স্ত্রী প্রথমে আপত্তি করলেন - সে কি কথা, মথুরাধিপতির জন্য নিয়ে যাবে ক্ষুদের নাড়ু! কিন্তু স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে প্রস্তুত করে দিলেন ক্ষুদের নাড়ু।

সেই নাড়ু চাদরের এক প্রান্তে বেঁধে সুদামা যাত্রা করলেন মথুরাভিমুখে। যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে আর এক বিভ্রাটের সম্মুখীন হলেন। একখানিও পারাপারের নৌকা নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এমন সময় হঠাৎ একখানি নৌকা তাঁর দৃষ্টি গোচর হল। মাঝিকে সঙ্কেত করলেন। মাঝি এসে তাঁকে পার করে দিলেন। এসে পৌঁছলেন মথুরায়।

রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে এসে দেখলেন সিংহ দরজা প্রহরী-বেষ্টিত, রাজপুরীর চতুর্দিকে আরও কত প্রহরী। প্রবেশ করবার উপায় নেই।

সুদামার ভাবনা কেমন করে তাঁর সখার সঙ্গে দেখা হবে। আজ কি সব ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে? পরম প্রিয়তমের সান্নিধ্য লাভে কি আজ তিনি সত্যই বঞ্চিত হবেন? এই সঙ্কট হতে পরিত্রাণ কি হবে না? চিত্ত আলোড়িত।

অবশেষে সাহসে ভর করে নিজ পরিচয় দিয়ে আগমন বার্ত্তা প্রেরণ করলেন তাঁহার সখা সমীপে।

সখার আগমন বার্ত্তা পাওয়া মাত্র রাজকার্য্য পরিচালনায় রত শ্রীকৃষ্ণ ছুটে চললেন সখাকে সাদরে আহ্বান করে আনবার নিমিত্ত। মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্ম্মচারী বৃন্দ সকলেই হতবাক। সেদিকে কোনও দৃষ্টি নেই।

ভক্ত এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কি আর স্থির থাকতে পারেন? ভক্ত এলে, ভগবানকে যে কোন কার্যেই তিনি লিপ্ত থাকুন না কেন তা ক্ষুদ্রই হোক বা মহৎই হোক সব ছেড়ে ভক্ত সমীপে আসতেই হবে। কারণ তাঁর হৃদয় আর ভক্তের হৃদয় যে এক। যেখানে ভক্ত সেখানেই তিনি।

তাই স্বয়ং শ্রীমুখে উদ্ধবকে বললেন-

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন প্রিয়ঃ।। (ভাগবত-৯/৪/৬৩)

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা।।
যে দারাগারপুত্রাপ্ত প্রাণান বিত্তমিমং পরম।
হিত্বা মাং শরণং যাতা কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে।।
ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।

(ভাগবত ৯/৪-৬৩-৬৯)

আমি একমাত্র ভক্তের অধীন। ভক্তের নিকট আমার কোনও স্বতন্ত্রতা নেই। ভক্তজনই আমার একমাত্র প্রিয়। ভক্ত ভক্তির দ্বারা আমাকে বশীভূত করেন, যেমন সাধ্বী স্ত্রী সেবা দ্বারা সাধু পতিকে বশীভূত করেন। ভক্ত ভক্তিদ্বারা ভগবানের অধীন ও তদংশীভূত হয়ে থাকতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করেন। ভক্ত যতই ভগবানের অধীন দাস হতে চান ভগবান তদপেক্ষা সহস্রগুণে ভক্তের দাস হতে চাহেন, এই আমার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীকৃষ্ণ আলুথালু বেশে ছুটে আসছেন। তাঁর রাজবেশ স্খলিত হয়ে পড়ছে। অধীর ব্যাকুলতা ভক্তের জন্য, কোন দিকে দৃকপাত নেই। সখার হাত ধরে নিয়ে এলেন তাঁহার নিজ কক্ষে। সুদামা অবাক হয়ে দেখছেন কিছুরই অভাব নেই। সেই বিশাল রাজহর্ম্ম্যতলে কত খাদ্যসম্ভার, কত সুখাদ্য পানীয়ের আয়োজন।

এখানে এই সামান্য ক্ষুদের নাড়ু কেমন করে বার করবেন? লজ্জায় সুদামা অধোবদন, বেদনায় চিত্ত ব্যথিত। ভক্তের বেদনায় ভগবানও বেদনাতুর। তিনিও হলেন ব্যথিত।

তিনি সর্বজ্ঞ সবই বুঝতে পারছেন, সবই জানেন। তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। ক্ষুদের নাড়ুগুলি বলপূর্বক কেড়ে নিয়ে বললেন, "আমার জন্য উপহার এনেছ তবু এতক্ষণ দাও নাই।" অতঃপর সেগুলি পরম তৃপ্তি সহকারে আহার করতে করতে বললেন, "সখা নিয়তই কত সুখাদ্য ভোজন করছি, সুপেয়

পানীয় পান করছি, কিন্তু এমন অমৃত কোন দিনও আস্বাদন করিনি, কি অমৃতই তুমি এনেছ"।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন সবগুলি ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা কিছু কার্য্য সাধন কর সমস্তই আমাকে অর্পণ কর, এমন কি যাহা আহার কর তাহাও- "তদকুরুষ্বমদর্পণম"। (গীঃ ৯/২৭)। এই উক্তির তাৎপর্য্য- যদি নাও দাও আমি জোর করে কেড়ে নেব, কারণ ভক্তের ভক্তিরস আস্বাদন করবার জন্য "তিনি" সদাই লালায়িত। তিনি চান ভক্তের ভক্তি চন্দনে জড়িত মন প্রাণ, বাহিরের উপকরণ অপেক্ষাও ভক্তের হৃদয়ের ভক্তিই তাঁর নিকট সর্ব্বাধিক সমাদৃত।

তাই ভক্তের বস্ত্রাঞ্চল থেকে ক্ষুদের নাড়ু জোরপূর্বক বার করে শ্রীমুখে অর্পণ করলেন। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এই অমৃত রস, এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বোধ, এই অভিন্ন হৃদয়।

অতঃপর সুদামা ও শ্রীকৃষ্ণ ভোজন কক্ষে পাশাপাশি বসে আহার গ্রহণ করলেন। গরীব ব্রাহ্মণ সুদামার কি তৃপ্তি, ততোধিক তৃপ্তি ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের।

আহার পর্বসমাধান্তে উভয়ে আবার ফিরে এলেন মথুরাপতির স্বীয় প্রকোষ্ঠে। সুখ দুঃখের কত কাহিনী সুদামা বললেন তাঁহার সখাকে, আর বললেন "তুমি চলে আসাতে হয়েছে ব্রজধাম প্রাণহীন। নেই হাসি নেই গান। ব্রজবাসীদের মুখে তোমারই কথা তোমারই লীলা প্রসঙ্গ। তাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তোমার অনুস্বরণ ও অনুচিন্তন একমাত্র সান্ত্বনা। তুমি তো শুধু সখা নও, তুমি যে পরম দেবতা।"

শ্রীকৃষ্ণ শুনেছেন ও তাঁহার আঁখিও অশ্রুসজল হয়ে উঠছে। কিয়ৎক্ষণ পর সুদামা বললেন, "আজ যে কি বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলাম তা আর তোমাকে কি বলব!" "কেন কি হয়েছিল?" সুধালেন শ্রীকৃষ্ণ। সুদামা বললেন "মথুরাভিমুখে যাত্রা করে যখন যমুনার তীরে পৌঁছিলাম দেখলাম সদাহাস্যময়ী যমুনায় সেকী উত্তাল তরঙ্গ, সন্তরণ করেও ওপারে মথুরানগরীতে যাবার উপায় নেই, পারাপারের একখানি নৌকাও নেই। হতাশ হয়ে বসে ভাবছি তোমায় চাক্ষুষ দর্শনের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হলাম। এমন সময় দেখি একখানি পারাপারের নৌকা, মাঝিকে সঙ্কেত করা মাত্র

মাঝি নৌকা নিয়ে এগিয়ে এসে পার করে দিল আমাকে। তাই তো তোমাকে চাক্ষুষ দর্শনে ধন্য হলাম।"

সুদামা লক্ষ্য করলেন শ্রীকৃষ্ণ হাসছেন। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন "তুমি আসছ আমি জেনেছিলাম, আমিই মাঝির বেশে তোমাকে পার করে এনেছি। কেশব কৈবর্ত্ত রূপে আমি আমার অনন্য ভক্তদের তরঙ্গসঙ্কুল ভবসাগর উত্তীর্ণ করিয়ে দিই, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। আমার চাক্ষুষ দর্শনে তাহাদের হয় সর্ব্বোত্তম প্রাপ্তি।" শ্রীকৃষ্ণের এবম্বিধবাক্য শ্রবণে সুদামা লুটিয়ে পড়লেন তাঁর আরাধ্য দেবতার চরণে।

তিনি আরও সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন এই পৃথিবীতে যিনি অধ্যাত্মভাবে তেজোময় অমৃতপুরুষ অর্থাৎ তাঁর আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, ইনিই তিনি, ইনিই সত্য, ইনিই শিব, ইনিই সুন্দর, ইনিই অমৃত, ইনিই আনন্দ ব্রহ্ম, ইনিই প্রেমময়, ইনিই সব।

ভক্ত কান্তকবির গানে সুর মিলিয়ে নিজেকে ঝঙ্কৃত করতে ইচ্ছা হয়।

তুমি সুন্দর, তাই তোমার বিশ্বসুন্দর শোভাময়,
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল বিশ্বনন্দন প্রভাময়,
তুমি অমৃত বারিধি হে, তাই তোমার ভুবন ভরি হে,
পূর্ণ চন্দ্রে, পুষ্প গন্ধে সুধায় লহরী বয়।
ঝরে সুধা জল, ধরে সুধা ফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয়,
তুমি প্রেমের চিরনিবাস হে, তাই প্রাণে প্রাণে প্রেম পশে হে,
তাই মধুরতাময় বিটপীলতায় মিলে প্রেমকথা কয় হে,
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয় গাহে তব প্রেম জয় হে।

পিতৃপ্রসঙ্গ **ডঃ সুভাষ চন্দ্র শাসমল**

(শান্তিনিকেতনের ভাষণমালায়)

রবীন্দ্র জীবন ভাবনা ও সাহিত্য সাধনায় পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব এক অনস্বীকার্য সত্য। মহর্ষি-জীবনের বিপুল অধ্যাত্ম সম্পদের সার্থক উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ। বিশাল রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রান্তরে পিতৃপ্রসঙ্গ বারে বারেই এসেছে। আমরা সেইসব প্রসঙ্গ আপাততঃ আলোচনা না করে তিনি তাঁর শান্তিনিকেতনের ভাষণমালায় যে সমস্ত স্থানে পিতৃপ্রসঙ্গ এনেছেন সেই সমস্ত ভাষণমালাই এখানে আলোচনা করবো সংক্ষেপে।

সতেরো খণ্ডে প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থখানি শান্তিনিকেতন এবং অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ভাষণমালার সংকলন। এই গ্রন্থে মহর্ষি প্রসঙ্গ রয়েছে এমন কতকগুলি ভাষণ হল – দীক্ষা, আশ্রম, ভক্ত, মুক্তির দীক্ষা, অগ্রসর হওয়ার আহ্বান, দীক্ষার দিন। এই ভাষণগুলি ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষ্যে ভাষিত হয়েছিল। ১২৫০ সালের ৭ই পৌষ মহর্ষি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ওই দিনটির তাৎপর্য মহর্ষির জীবনে খুব গভীর ছিল এবং তাঁরই ইচ্ছানুসারে রবীন্দ্রনাথ ৭ই পৌষের উৎসব শান্তিনিকেতনে প্রবর্তন করেন। 'মৃত্যুর প্রকাশ' শীর্ষক ভাষণটি মহর্ষির চতুর্থ বার্ষিক মৃত্যুদিবসে প্রদত্ত হলেও এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা যেতে পারে; কারণ তার আলোচ্য বিষয় অন্যগুলির অনুরূপ।

এই সমস্ত ভাষণের মধ্য দিয়ে মহর্ষির দীক্ষা-দিবসটিকে একটি সুগভীর তাৎপর্যবাহী হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কি সেই তাৎপর্য? সংকুচিত জীবন হতে ব্যাপক ক্ষেত্রে মনকে মুক্তিদানের বাণীবাহী হ'ল ৭ই পৌষের বাণী। মহর্ষির দীক্ষাই যেন সেই বীজ যা আপন হতেই অঙ্কুরিত হয়ে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের রূপ পেয়েছে। আশ্রম তাঁর দীক্ষা হতে প্রেরণালাভ করবে, আশ্রম তাঁর জীবনের

দৃষ্টান্ত হতে শিক্ষা লাভ করবে, বলছেন – "সেই সাধু-সাধক তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো দিনটিকে, তাঁর দীক্ষার দিনটিকে, এই নির্জন প্রান্তরের মুগ্ধ আকাশ ও নির্মল আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই মহা দিনটির চারিদিকে এই মন্দির, এই আশ্রম, এই বিদ্যালয় প্রতিদিন আকার ধারণ করে উঠছে; আমাদের জীবন আমাদের হৃদয় আমাদের চেতনা একে বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছে ; এই দিনটিরই আহ্বানে কল্যাণ মূর্তিমান হয়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছে; এবং তাঁর সেই সত্যদীক্ষার দিনটি ধনী ও দরিদ্রকে, বালক ও বৃদ্ধকে, জ্ঞানী ও মূর্খকে বর্ষে বর্ষে আনন্দ উৎসবে আমন্ত্রণ করে আনছে। এই দিনটিকে যেন আমাদের অন্যমনস্ক জীবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে না রাখি - একে ভক্তিপূর্বক সমাদর করে ভিতরে ডেকে নাও, আমাদের তুচ্ছ জীবনের প্রতিদিনের যে দৈন্য তাকে সম্পদে পূর্ণ করো!" (-'দীক্ষা')।

মুক্তির দীক্ষায় মহর্ষিকে 'মহাত্মা' সম্বোধন করে বলেছেন, "আমাদের আশ্রমের উৎসবের ভিতরকার তত্ত্বটি কী তাই আজ আমাদের বিশেষ করে জানার দিন। যে মহাত্মা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজ তাঁরই দীক্ষা দিনের সাম্বৎসরিক। আজকের এই উৎসবটি তাঁর জন্মদিনের বা মৃত্যুদিনের উৎসব নয়। তাঁর দীক্ষা দিনের উৎসব। তাঁর এই দীক্ষার কথাই এই আশ্রমের ভিতরকার কথা।

সকলেই জানেন যে, এক সময়ে যখন তিনি যৌবন বয়সে বিলাসের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছিলেন তখন হঠাৎ তাঁর পিতামহীর মৃত্যু হওয়াতে তাঁর অন্তরে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হল। সেই বেদনার আঘাতে চারিদিকে থেকে আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেল। যে সত্যের জন্যে তাঁর হৃদয় লালায়িত হল তাকে তিনি কোথায় পাবেন, তাকে কেমন করে পাবেন, এই ভেবে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।"

গায়ত্রী মন্ত্র মহর্ষির প্রিয় মন্ত্র। আশ্রম সেই মন্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণ করেছে। অন্তরের সাথে বাহিরের, আত্মার সাথে বিশ্বের যোগ স্থাপন করাই তার তাৎপর্য। সেই তাৎপর্য আশ্রমের ব্যবস্থায় প্রতিফলিত। আশ্রম যে কোনো সম্প্রদায় বিশেষের নয়, তা বিশ্বমানবের সাধনা ও শিক্ষার ক্ষেত্র, এ বিষয়ে তিনি পিতার ধর্ম-সম্পর্কিত আদর্শের অনুসরণ করেছেন।

'সামঞ্জস্য' শীর্ষক প্রবন্ধে মহর্ষির সাধনতত্ত্ব ভারতীয় সাধনেতিহাসের পটভূমিতে ব্যাখ্যাত। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন এখানে মহর্ষির ধর্মচিন্তায় একটি সামঞ্জস্যবোধ পরিস্ফুট। তিনি জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। আবার তাঁর পরিকল্পিত উপাসনা ব্যাবস্থায় কর্মের স্থানও ছিল। এইভাবে মহর্ষির ধর্মচিন্তায় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, মহর্ষির এই ধর্মভাবনা - এই সামঞ্জস্যের দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শনেও পরিলক্ষিত হয়।

মোটামুটিভাবে আমরা দেখলাম মহর্ষি সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীর কিছু প্রবন্ধে মহর্ষির সাথে শান্তিনিকেতনের যোগের কথা, মহর্ষির বাণী হতে মহর্ষির চিন্তা হতে প্রেরণা লাভের কথা, মহর্ষির দীক্ষার তাৎপর্যের বিষয় আলোচিত। আবার দেখি, মহর্ষির ধর্মচিন্তার কথাও একটি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। 'সামঞ্জস্য' শীর্ষক প্রবন্ধে মহর্ষির ধর্মদর্শনের কথা ব্যাখ্যাত।

রবীন্দ্রনাথের ধারণায় মহর্ষির জীবনে উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের প্রভাব বর্তমান ছিল। সেই জন্যই তিনি সংসারকে ত্যাগ করেননি। ঈশ্বর যে প্রচ্ছন্নভাবে সবকিছু ব্যাপ্ত করে আছেন এই বোধ দ্বারাই তিনি সংসারের বিভিন্ন কর্মে নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক উক্তিটি এই - "তিনি সংসারকে ত্যাগ করেননি, সংসারের সুরকে ভগবানের ভক্তিতে বেঁধে তুলেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত করে দেখাবার তপস্যা করেছিলেন।" (-সামঞ্জস্য)।

মহর্ষি দীক্ষা নিয়েছিলেন প্রাচীন বাঁধা পথ বর্জন করে স্বাধীন চিন্তার পথে সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে ধর্মসাধনা করবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির মৃত্যু দিবসকে স্মরণ করে বলেছেন যে দীক্ষার দিনে মহর্ষি যে ব্রত গ্রহণ করেছিলেন মৃত্যুর দিনে তা' উদ্‌যাপিত হয়েছে। মানুষ দীপ হতে দীপ জ্বালে। সুতরাং মহর্ষির মৃত্যু দিবস হওয়া উচিত তাঁর উত্তর পুরুষের দীক্ষার দিন, যে মহৎ আদর্শ তাঁর জীবনে প্রতিফলিত সেই আদর্শে দীক্ষার দিন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন -

"শিখা থেকে শিখা জ্বালতে হয়, তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদেরও অগ্নি গ্রহণ করতে হবে। এইজন্য ৭ই পৌষ যদি তাঁর দীক্ষা হয়, ৬ই মাঘ আমাদের দীক্ষার দিন। তাঁর জীবনের সমাপ্তি আমাদের জীবনকে দীক্ষা দান করে - জীবনের দীক্ষা।" (-মৃত্যুর প্রকাশ) ।

মহর্ষির দীক্ষার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। তা যে বাণী বহন করে তা হল মুক্তির বাণী। প্রচলিত আনুষ্ঠানিক কর্মে মহর্ষি তৃপ্তি পাননি। তার বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করে যে ধর্ম সম্পর্কিত আদর্শে তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন, তাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাঁর দীক্ষার মধ্যে রয়েছে গভীর তাৎপর্য। তা হল জড় সংস্কারের বন্ধন হতে মুক্তির প্রয়োজনীয়তা। বলেছেন – "সত্যকে তিনি জীবনে প্রত্যক্ষভাবে জানতে চেয়েছিলেন; দশজনের মুখের কথায়, শাস্ত্র বাক্যে, আচারে বিচারে তাকে জানবার চেষ্টাকে তিনি পরিহার করেছিলেন। সেই যে তাঁর উদ্বোধন সে প্রত্যক্ষ সত্যের উদ্বোধন, সেই প্রথম যৌবনের প্রারম্ভে যে তাঁর দীক্ষা গ্রহণ, সে মুক্তির দীক্ষা গ্রহণ। ... চারিদিকের জড় সংস্কারের আবরণ থেকে তিনি মুক্তি চেয়েছিলেন।" (-মুক্তির দীক্ষা)।

এই দৃষ্টান্ত হতে আশ্রমবাসীদের তিনি এই শিক্ষা গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন যে আশ্রমের বিকাশ যেন কোনো সঙ্কুচিত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বিঘ্নিত না হয়, তার মধ্যে যেন কোনো সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ না ঘটে। তিনি বলেছেন – "বাইরের ক্ষেত্রে মহর্ষি আমাদের কোন বড়ো জিনিস দিয়ে গিয়েছেন?

কোন সম্প্রদায় নয়, এই আশ্রম। এখানে আমরা নামের পুজো থেকে দলের পুজো থেকে আপনাদের রক্ষা করে সকলেই আশ্রয় পাব এই জন্যই তো আশ্রম। ..... কোনো সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সংকুচিত না হয়।" (-'অগ্রসর হওয়ার আহ্বান')।

মহর্ষির আদর্শ, তাঁর বাণী, তাঁর জীবনের পথ অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র নিজের জীবন নয়, আশ্রমবাসী সকলকেই সেই আদর্শানুসরণে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হয়েছিলেন যে মহর্ষির সাধনা সম্পূর্ণভাবে আশ্রমের মাঝে মুকুলিত এবং বিকশিত হয়েছিল। তাই 'অগ্রসর হওয়ার আহ্বান' প্রবন্ধে বলেছেন-

'সেইজন্য আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে যে মহর্ষির জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সমাজে হয়নি, তা এ' আশ্রমে হয়েছিল। বিশেষ সমাজের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল সংযুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সেইখানেই তাঁর চিরজীবনের সাধনা তার বিশেষ সার্থকতা লাভ করেনি, এই আশ্রমের মধ্যেই তার সার্থকতা সম্পূর্ণ হয়েছিল।"

"আমরা এই ত্রিশ কোটি লোক, সহস্র বৎসর যাবৎ যে কোন মুষ্টিমেয় বিদেশী আমাদের ভূলুণ্ঠিত দেহকে পদ-দলিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাদেরই পদানত হইয়াছি, কেন? কারণ উহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস ছিল, আমাদের ছিল না।"

-- স্বামী বিবেকানন্দ

এসেছিলেন তিনি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর কাতর আহ্বানে এই বঙ্গের মাটিতে, কাতরভাবে না ডাকলে কি আর তিনি আসেন? তাঁর পুণ্য আবির্ভাবের সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন হতে শুরু করলো। মানুষ পশু পাখী বৃক্ষলতা সকলে যেন সজীবতা লাভ করলো। আশ্রয়হীন পেলো আশ্রয় - এমন এক আশ্রয় যেখানে নেই কোনো বাছবিচার। তাঁর কাছে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল- সব সমান। তাই তো মহাজন গেয়েছেন - 'ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি। কবে বা ছিল এ রঙ্গ।' আর তাইই ত' তাঁকে সাম্যবাদের প্রবর্ত্তক বলে অভিহিত করেছেন সাম্যবাদীগণ। বললেন - 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।' এই ত' তাঁর আদর্শ - এই ত' তাঁর বাণী - এই ত' তাঁর জীবন দর্শন। শুধু মানুষ নয় - পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ, গাছের পাতা, ফুল, সব কিছুর মধ্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আছেন- এই শিক্ষা এই ভাবনা যিনি নিজের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন - এবং সকলকার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ - শ্রীচৈতন্য। শুধু উপদেশ দেওয়া নয় নিজের জীবন দিয়ে তা বুঝিয়ে গেছেন, হিংসা নয়- প্রেম দিয়ে সকলকার অন্তর জয় করা যায় – এও তিনি বুঝিয়ে গেছেন, তাই তাঁর আবির্ভাব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নয় - হরিনাম দিয়ে সকলকার হৃদয় শোধন করবার সঙ্কল্প - বিশ্বকে প্রেমে ভরে দেবার সঙ্কল্প নিয়েই তাঁর আবির্ভাব। একা নয় - প্রভু নিত্যানন্দ এসেছেন- এসেছেন শ্রীবাস, গদাধর, হরিদাস প্রমুখ শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী হয়ে। মায়ার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে যারা তাদের উদ্ধার করবার সঙ্কল্প - শ্রীগৌরাঙ্গ তাই বললেন - 'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।' বললেন 'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বল, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।' বললেন 'সর্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর।' কৃষ্ণ ভগবান কোথায় থাকেন? তার উত্তরেই বললেন – 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।' কাউকে হিংসা নয় – কাউকে দূরে সরিয়ে দেওয়া নয়। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম এমন যে না চাইতেই আদর করে কোলে তুলে নেয়। বর্তমানে

দিকে দিকে চীৎকার – 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন', 'সংহতি প্রতিষ্ঠা করুন।' শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই সংহতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথাই বলে গেছেন আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে। তাঁর আদর্শ তাঁর বাণী যদি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যায় - যদি ঘরে ঘরে তাঁর কথা পাঠ করা হয় তবে আর চীৎকার করে সংহতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আবেদন জানাবার প্রয়োজন হয় না। স্বামী বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' - এই বাণী কি মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাণীরই প্রতিধ্বনি নয়? এই সমস্ত ধর্মনায়কদের কথা ভালোভাবে স্মরণ করবার সময় এসেছে। তাঁদের বাণী আদর্শের যথাযথ ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন, যদি তা না হয় তবে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেও সংহতি প্রতিষ্ঠা হবে না - হবে না সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আদেশকে মাথায় নিয়েই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন নাম প্রেমের ডালি নিয়ে। নিরভিমানের শিক্ষা দিলেন নিত্যানন্দ। ক্রোধ পরিত্যাগ করে, নিরভিমান ভাবে কিভাবে সকলকে জয় করা যায় সেই শিক্ষাই তাঁর শিক্ষা, সমপ্রাণতার শিক্ষাই প্রভু নিত্যানন্দের শিক্ষা। তাই সমালোচকগণ বলেন এক বৃন্তে দুটি ফুল - গৌর-নিতাই। একে অপরের পরিপূরক। তাই গৌর নামটা উচ্চারণ করলেই 'নিতাই' আপনা থেকেই এসে পড়ে। প্রয়াত সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেন – 'দ্বাররক্ষী নিত্যানন্দ। সব ভার তাঁর পায়ে করে দাও জমা। গৌর কৃপা সুদুর্লভা। আগে যদি নাহি মেলে নিতাইয়ের ক্ষমা।' মহাজন গেয়েছেন-

'নিতাই পদ কমল কোটিচন্দ্র সুশীতল
যার ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাই-এর পায়।।

শ্রী গৌরাঙ্গদেবই বলেছিলেন - শুধু নিজের মঙ্গল ভাবনা নয় সকলকার মঙ্গল ভাবনা কর। বললেন - 'ভারত ভূমিতে মনুষ্য জনম হৈল যার। জনম সফল কর করি পর উপকার।' অপরের কিসে মঙ্গল হয় সেই ভাবনা কর। এর নামই ত

সংহতি - এর নামই ত সম্প্রীতি। প্রবর্ত্তন করলেন নামসংকীর্ত্তনের - মহোৎসবের। নামসংকীর্ত্তন যজ্ঞ মণ্ডপে বা মহোৎসবের আঙ্গিনায় যে চিত্র ফুটে ওঠে তা কি সংহতি ও সম্প্রীতির চিত্র নয়? তবে কেন তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখা?

মিজোরাজ্যের রাজধানী- আইজল

শ্রী অরূপকুমার ভট্টাচার্য্য

লুসাই ভাষায় 'মি' মানে মানুষ আর 'জো' অর্থ উচ্চভূমি। এককথায় মিজোরাম বলতে বোঝানো হয় পাহাড়ি মানুষের দেশ। ২৯৫০ ফুট গড় উচ্চতার মিজোরাম রাজ্যের আয়তন ২১,০৮৭ বর্গকিলোমিটার হলেও আমরা দেখতে গেছিলাম ৩৭১৪ ফুট উচ্চতার রাজধানী আইজলকে, যার আয়তন মাত্রই ৪৫৭ বর্গ কিলোমিটার। মিজো ভাষায় আইজল মানে ফলের বাগান। TLAWNG এবং TUIRIAL বা সোনাই নদীর উপত্যকার মিজোরামে চলতি পথে ফলের দোকানে পেঁপে, কলা আর আতার মত দেখতে PASSION ফ্রুট দেখতে পেলেও ফলের বাগানের খোঁজ করার সময় আমাদের ছিলনা। তবে ধাপে ধাপে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে যে ভাবে শহর সেজে উঠেছে, অদ্ভুত সেই তুলনাহীন দৃশ্য দেখার পর বাগানের কথা আর মনে পড়েনি। আইজলের কাছাকাছি 'লুঙ্গলেই' এর পথে ৮৩ কিলোমিটার দূরে 'তামডিল' লেকের কথা আমরা জানতাম, কিন্তু বৃষ্টিভেজা মিজোরামের একটা সকাল মাটি হওয়ায় অতদূর আমরা পৌঁছাতে পারিনি। দেখা হয়নি ১৩৭ কিলোমিটার পার হয়ে মিজোরামের উচ্চতম জলপ্রপাত VANTAWNG-ও । তবু মিজোরামকে বুড়ি ছোঁয়া করার পরেও যে এত ভালো লেগে গেলো তাঁর প্রধান কারণ সঙ্গগুণ। ৫ থেকে ১৩ই নভেম্বর এক্সপ্লোরার গ্রুপের সাথে মিজোরাম ত্রিপুরা নাগাল্যান্ড ঘুরে বেড়াবার সময় ম্যানেজার শিবনাথ সহ যে কুড়ি জনের সঙ্গ পেয়েছি তার বারোজন অবশ্য পূর্বপরিচিত। কিন্তু বাকিরাও যেভাবে কাঁঠালের আঠায় জড়িয়ে গেল, যে সন্ধ্যার গান-

গল্প-আড্ডায় মেতে ছোটখাটো সমস্যা আর বেশ কিছু না দেখাকে তিন তুড়িতে উড়িয়ে দিতে কারো মন কেমন কেমন করেনি। মিজোরামে বৃষ্টিই শুধু নয়, পুরো ট্যুরটাকেই ঘেঁটে দিয়েছিল ইন্ডিগো বিমান সংস্থা। নভেম্বরের পাঁচ তারিখে কোথায় সকাল ৮.৩৫ এ আকাশে উড়ে ৯.৪৫ এ আইজলের বিমানবন্দর LENGPUI পৌঁছে যাব, তা নয়, সমস্ত পাল্টে সে বিমান যখন কলকাতার মাটি ছাড়লো তখন সওয়া দুটো বেজে গেছে। তবু হয়তো ইনারল্যান্ড পারমিটে ছাপ মারিয়ে ৩০ কিলোমিটার দূরে 'আইজল গেস্ট হাউস' পৌঁছাবার আগে দিনের আলো ফুরিয়ে যেত না, যদি না বাধ সাধতো শহরে ঢোকার মুখে অফিস টাইমের জ্যাম। ক্ষতিপূরণ অবশ্য পথেই মিলে গেল। অন্ধকার ঘনাতেই দেখতে পেলাম আইজল পাহাড়ে যেন লক্ষ হীরের ঝলকানি। ঝলমলে পাহাড় যেন 'আইজল গেস্ট হাউস' রূপে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। গেস্ট হাউসের 'রিসেপশন' রাস্তার সমতলে হলেও সেই ফ্লোরে আমাদের জন্য নির্ধারিত ঘরের সংখ্যা তিনের বেশি ছিলনা। এখানে লিফটের সুবিধা নেই, তবু লটারির চক্করে কেউ ওপরে অথবা নীচে ঘর পেলেও তা নিয়ে কারো মুখ বেজার হতে দেখিনি। কারণটা বোধ হয় গেস্ট হাউসের প্রতিটি ঘর থেকেই আইজলের অসাধারণ দৃশ্য । আমাদের ঘর ২০১ নম্বরে পৌঁছাতে হলে ৩৬ সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে হয়েছিল বটে, কিন্তু ঘরের আয়তন আর সাত সতেরো গ্যাজেটের সঙ্গে পর্দার বাইরের দৃশ্য দেখে সিঁড়ি ভাঙ্গার কষ্ট আর মনে থাকেনি। কি নেই সেই ঘরে? ফ্রিজ, ইলেকট্রিক কেটলি, বাসন কোষন সমেত গ্যাসবার্নার, মাইক্রোওভেন তো বটেই, তাছাড়া ওয়াশিং মেশিন এমনকি ইস্ত্রি করার ব্যবস্থাও রয়েছে সেই বিশাল রাজকীয় ঘরটায়। সমস্যা একটাই - ২০ জনের হুল্লোড়ে ব্রেকফাস্ট অথবা ডিনারের টেবিল জমিয়ে দেওয়ার কোন সুযোগ এখানে নেই – ডাইনিং রুমটা যে নিতান্তই ছোট!

পরদিন সকালে ঝিরঝিরে বৃষ্টি ভয় দেখালেও আকাশে সূর্যদেবের মুচকি হাসির আভাস ছিল। ঘন্টাখানেক দেরী হয়ে গেলেও তিনটে ইনোভা যখন সকলকে নিয়ে SOLOMON TEMPLE পৌঁছালো বৃষ্টি ততক্ষণে পাততাড়ি গুটিয়েছে। সলমন

অবশ্য নামেই টেম্পল, আসলে এটি মিজোরামের এক বিখ্যাত চার্চ । মূল মন্দিরটি ছিল জেরুজালেমে - খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে যার প্রতিষ্ঠা শুরু করেছিলেন বাইবেলে উল্লেখিত ইহুদী রাজা ডেভিড। পরে অবশ্য মন্দিরটি সম্পূর্ণ করেন তার পুত্র সলোমন। সেই সলোমন আর রাণী শেবা- যাদের গল্প আমরা পড়েছি 'কিং সলোমন'স মাইনস' লেখায়। মন্দির তৈরী হলেও ব্যাবিলনের রাজা দ্বিতীয় নেবুচাডনেজার অজানা কোন কারণে মন্দিরটি ধ্বংস করে ফেলেন। পরবর্তী কালে ইজরাইলের গভর্নর যিনি পরে রোমান সিনেটের অনুমোদনে 'ইহুদিদের রাজা' উপাধি লাভ করেন সেই Herod the Great মন্দিরকে পুনর্নির্মান করেন। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোম সম্রাট টাইটাস মন্দিরকে শেষবারের মত মাটিতে মিশিয়ে দিলে বহুবছর পরে প্যালেস্টাইনের মুসলিমরা সেই পবিত্র মন্দির ভূমিতে তৈরী করে বিশাল মসজিদ- 'DOME OF ROCK'- যা আজও বিরাজমান। আসল সলমন মন্দির রয়ে যায় কেবল মানুষের কল্পনায় আর গল্প গাথায়। সুখের বিষয় পৃথিবীর কোন কোন স্থানে এখন এই মন্দিরের রেপ্লিকা তৈরী হয়েছে, যার অন্যতম Dr. L. B. Sailo-র স্বপ্নে দৃষ্ট আইজলের এই ৩০২৫ স্কোয়ার মিটারের বিশাল চার্চ। কিন্তু আয়তন নয়, মূল মন্দিরের চারকোণে চারটি ক্রাউন মাথায় টাওয়ার, চারটি প্রবেশ পথে গথিক স্থাপত্যে তৈরী পিলার, সর্বোপরি সবুজ পরিবেশের মাঝখানে ২০১৭'র শ্বেতশুভ্র চার্চ - একে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। মন চাইছে মূল প্রার্থনা কক্ষে একবারটি প্রবেশ করে দেবতার পায়ে আত্ম নিবেদন করি, কিন্তু রবিবারে ভিতর বাইরে মিলিয়ে বারো হাজারের বেশি ভক্ত প্রার্থনায় সামিল হতে পারলেও আজ বৃহস্পতিবার শুধু কাঁচের দরজা দিয়েই ভিতরে উঁকি দিতে পারি। আর ফটো সেশন? - সে তো ছিলই। হয়তো আমাদের মাতোয়ারা দেখে সেদিনের ডেভিড- সলোমন থেকে ২০২১ এ প্রয়াত ডঃ সাইলো পর্যন্ত খুশীর হাসি হেসেছিলেন, আবার দুঃখও পেয়েছেন আমরা মূলকক্ষে ঢুকতে পারিনি বলে।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল মিজোদের ট্র্যাডিশনাল ভিলেজ FALKAWN ZOKHUA. বৃষ্টি না থাকলেও ঘন কুয়াশার আড়ালে এখানকার ছোট ছোট

কুটীরগুলো এমন ভাবে লুকিয়েছিল, কাছে না গেলে হদিস পাওয়াই মুশকিল। সামান্য ঢালু পথ বেয়ে সেই গ্রামের প্রবেশ দ্বার পথে আমন্ত্রন জানালো যে রবার গাছটি, তার কান্ড অথবা পাতাবাহারের কারণে নয়- থমকে দাঁড়ালাম তার শিকড়ের অসাধারণ কারুকার্য দেখে। তারপর পায়ে পায়ে একেকটা বাঁশ, কাঠ আর খড়ে ছাওয়া কুটীরের দরজা পেরোতেই একেবারে অন্যধরণের অভিজ্ঞতা। কোন কুটীর দোকানি ছাড়াই বিক্রয়যোগ্য পণ্য নিয়ে অপেক্ষা করছে সম্ভাব্য ক্রেতার জন্য , আবার আবার গাঁয়ের প্রধান, প্রবীন অথবা কুমার যুবকদের জন্য প্রাণীর স্টাফড মাথা আর মাউন্ট শিং সমৃদ্ধ কুটীরগুলো সাক্ষী দিচ্ছে মিজোদের শিকারের দক্ষতা। মিজোরা ভিক্ষা করতে জানেনা, শিক্ষার হার সামগ্রিক ভাবে দেশের তুলনায় (৭৭%) অনেকটাই বেশি - প্রায় ৯৮ শতাংশ। আর সততা? দোকানে যে দোকানদার নেই তা' তো আগেই বলেছি। রয়েছে শুধু পণ্য আর তার বিক্রয়মূল্য। প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে এরা পাশে রাখা ক্যাশবাক্সে মূল্য জমা করে দেয়। পুরো কেনাবেচাটাই চলছে পারস্পরিক বিশ্বাসের জোরে। মিজোদের সততার আরো প্রমাণ পেয়েছি গ্রামের 'আর্ট অ্যান্ড কালচার' ডিপার্টমেন্ট দেখার পর মিজোরামের 'স্টেট মিউজিয়ম' দেখতে গিয়ে। আসছি সে কথায়-

দিনের শুরুটাই যেহেতু বৃষ্টির কারণে দেরীতে হয়েছিল, তাই স্টেট মিউজিয়মের দিকে রওনা হওয়ার সময়ই মনে আশঙ্কা ছিল আমরা পৌঁছাবার আগেই না তার ঝাঁপ পড়ে যায়। প্রসঙ্গত, সোম এবং সরকারী ছুটির দিন ছাড়া মিউজিয়াম বিকেল চারটে পর্যন্ত খোলা থাকলেও নভেম্বর থেকে পুরো শীতের মরসুমটায় তার দরজা বন্ধ হয়ে যায় দুপুর সাড়ে তিনটের পরেই। আমরা যখন মিউজিয়ামের গেটে পৌঁছেছি তখন প্রবেশদ্বার খোলা থাকলেও টিকিট কাউন্টার বন্ধ হয়ে গেছে। কি আর করা! দুধের সাধ ঘোলে মেটাবো বলে লেখক পরিচয় দিয়ে স্টেট মিউজিয়মের দুটো বই, গাইড টু গ্যালারি আর 'CATALOGUE-II' কমপ্লিমেন্টারি কপি হিসেবে পেয়ে গেলাম বটে, কিন্তু তাতে কি আর অ-দর্শনের আক্ষেপ মেটে? হঠাৎই চিচিং

ফাঁক! মিউজিয়মের ম্যানেজারকে জপিয়ে আমাদের ম্যানেজার শিবনাথ আধঘন্টা ম্যানেজ করে নিল যাতে অন্ততঃ টিকিট কাউন্টারের ফ্লোরে হিস্ট্রি আর অ্যানথ্রোপলজি গ্যালারি দুটো দেখে নিতে পারি। জনা প্রতি প্রবেশ মূল্য ২০ টাকা দেওয়ার কোন প্রশ্নই ছিলনা, কারণ সিস্টেম ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। এপার বাংলায় হলে হয়তো টিকিট না দিলেও টিকিটের পয়সাটা ম্যানেজার পকেটস্থ করে ফেলতো। কিন্তু মিজোরাম - সততা যে এদের জীবনের অন্যতম মন্ত্র।

১৯৯৩ সালের ১৩ই জুলাই দ্বারোদঘাটন হওয়া ৬৮২ স্কোয়ার মিটার স্টেট মিউজিয়ামের টিকিট কাউন্টার সহ দুটি গ্যালারি গ্রাউন্ডফ্লোরে মনে হলেও আসলে তা তিনটি তলার উপর চার তলার মেঝে। এর ওপরের দুটি তলায় রয়েছে TEXTILE ও ARCHAEOLOGICAL গ্যালারি। নীচের একটি তলায় ZOOLOGICAL গ্যালারি থাকলেও বাকি দুটিতে রয়েছে মিউজিয়ামের অফিস আর স্টোর। মিউজিয়মটি আকারে ছোট হলেও সংগ্রহে অসাধারণ। আধঘন্টায় যে সব কিছু দেখে উঠতে পারবোনা তা' জানতাম। তাই যত না দেখেছি, ছবি তুলেছি তার চেয়ে অনেক বেশি। আর টিকিট কাউন্টার থেকে বিনা পয়সায় পাওয়া বই দু'টো তো ছিলই।

বৃষ্টি বাধ না সাধলে হয়তো 'LALSAVUNGA' পার্কে আমরা পা রাখতে পারতাম। কিন্তু সেজন্য নয় – সত্যি সত্যি হতাশ হয়েছি মিজোরামের তাজমহল KV PARADISE দেখতে না পেয়ে। DURTLANG-এর হিলটপে আর ১২৫৩ মিটার উচ্চতায় তৈরী হওয়া শ্বেতশুভ্র KV PARADISE শুধুই যে নয়ন শোভন তা, নয়, ২০০১ সালে এক দুর্ঘটনায় মৃত স্ত্রী 'VARTE'-র স্মৃতি রক্ষার্থে তার স্বামী KHAWLHRING-এর ভালোবাসার চিহ্ন এই স্মৃতিসৌধ যেন সত্যিই অশ্রুজলে গড়া। স্বামী স্ত্রীর আদ্যাক্ষর নিয়ে KV PARADISE তাই আজকের তাজমহল, যেখানে রচিত হয়েছে ভালোবাসার স্বর্গ।

আজকের পরিবর্তিত মিজোরাম কে দেখতে দেখতে প্রথমেই যে প্রশ্নটা মনে জাগে, কোথা থেকে এল বেশ কিছু ট্রাইব আর সাবট্রাইবের সমষ্টি এই মিজোরা? মিজোদের গানে গল্পে গাঁথায় যে গৌরবময় চ্যিনলুং সভ্যতার উল্লেখ পাই তার থেকে মনে হয় এদের আদি বাসস্থান ছিল চীনদেশের ইয়ালুং নদীর ধারে। খ্রিষ্টপূর্ব ২১০ শতকে চীনদেশে ভয়াবহ রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিলে এরা ক্রমে বার্মার দিকে অগ্রসর হয়। সম্ভবত ১৭-১৮ শতকে মিজোরা ইন্দো-বার্মা বর্ডারের চীন পর্বত থেকে 'TIAU' নদী অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। যেহেতু এদেশে মিজোদের ইতিহাস খুব বেশি পুরানো নয়, তাই মিজোরামে নেই কোন ঐতিহাসিক স্থান, মন্দির অথবা প্রাচীন দুর্গ। তবে স্বাধীনচেতা মিজোদের নয়নের মনি লালডেঙ্গার নেতৃত্বে লুসাই, বালতে, খার, পাইহতে এবং পাই - এই পাঁচ মেজর ট্রাইবের সাথে ১১টি মাইনর ট্রাইব যাদের সমষ্টিগত নাম আউজিয়া - মিলে ১৯৬১তে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট তৈরী হওয়ার পর ১৯৮৭'র ফেব্রুয়ারিতে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে পরিণত হওয়া মিজোরামে কিন্তু নতুন নতুন ট্যুরিস্ট স্পট গড়ে উঠছে। এমনই এক অসাধারণ ট্যুরিস্ট আকর্ষণ ২০২৫ সালের প্রথমে তৈরী হওয়া মিজোরামের প্রথম 'গ্লাস স্কাই ওয়াক'। আইজল পিক রিসর্টের মধ্যে ৩০ মিমি. শক্ত কাঁচের তৈরী এই স্কাইওয়াক থেকে পাখির চোখে পাহাড়ে ঘেরা আইজল শহর দেখার যে কি অনুভূতি তা' লিখে বোঝানো যাবেনা। সপ্তাহের প্রতিটি দিনই সকাল ৯ টা থেকে রাত্রি ১০.৩০ পর্যন্ত মাত্র ১০০ টাকার টিকিট কেটে স্কাইওয়াকের মজা নেওয়া গেলেও আইডিয়াল সময়টা বোধহয় সানসেট টাইম। প্রথমে দিনের আলোর আইজল, তারপর সূর্যাস্তের অপরূপ শোভা, পরিশেষে অন্ধকারের মাঝখানে আলোয় ঝলমল মিজোরাজ্যের রাজধানী – এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। সমস্যা একটাই, অতি উৎসাহীদের ফটো সেশন এখানে এমন ভাবে চলতে থাকে যে প্রাণ ভরিয়ে দৃশ্য দেখার সুযোগ মেলেনা।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ভাবেন আইজল দর্শন শেষ হয়ে গেল তবে ভুল করবেন। ছোট গল্পের মত এ' যেন শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না। কাল নতুন

পর্বের আগে রয়েছে আরও এক সূর্যোদয় - তার জন্য কোথাও ছুটতে হবেনা, দেখতে পাবো আইজল গেস্ট হাউস থেকেই।

সকালের আইজল

রাতের রূপ

লেংপুই এয়ারপোর্ট

কুয়াশা ঘেরা গ্রাম

অভ্যর্থনায় রবার গাছ

মিউজিয়ামে লেখক

আইজল গেস্ট হাউস

মিউজিয়ামের অভ্যন্তরে

কে ভি প্যারাডাইস

ত্লাং সাস্পেন্সান ব্রিজ

সলমন টেম্পল

বৈষম্য

সুনন্দন ঘোষ

হয়ত তাঁর নাম ছিল রণেন ,
ছোটবেলায় বুঝতাম না স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর অর্থ।
আমরা দেখতাম রণেনদা'র দাপট।

স্কুলের পাট চুকলো।
কলেজ থেকে ফেরার পথে এক বন্ধু বলল
রণেনদা'র চাকরি গেছে, তছরুপের অভিযোগে।
ভুলেও গেছিলাম।
হঠাৎ এক সকালে কলিং বেল,
বাড়ির দরজায় ঝুঁকে পড়া, গাল ভাঙা রণেন'দা,
বাবার সাথে দেখা করবে।
অদ্ভুত বিড়ম্বনা।
এত সকালে বাড়িতে বাবা নেই ... জিভে আসছে না,
চুরীর দায়ে চাকরী হারানো একটা লোক বাবাকে ডাকছে—
পা সরছে না।

বাবার সঙ্গে রণেন'দার কি কথা হল জানি না।
বাবা শোবার ঘরে গেলেন, আলমারী খুললেন,
বাইরের ঘরে এলেন,
রণেন'দা চলে গেল।

মাঝে মাঝে রণেন'দা আসতো।
বাবা ঘরে যেতেন, আলমারী খুলতেন,
বাইরের ঘরে আসতেন।
রণেন'দা চলে যেত।

আর একটু বড় হলাম।
একদিন বলেই ফেললাম, রণেনদা'কে টাকা দাও কেন?
শান্ত স্বরে বললেন – "ওর পরিবার আছে,
একটা ছোট মেয়ে আছে।"

রণেনদা ..... দুর্বল মানুষেরা ...
সামান্য ভুলের দায়ে নির্বাসনে যায় যাবজ্জীবন।
আর এক নির্মম রাজ্ঞী কোতোয়ালকে পাহারায় রেখে
গোপন নথি আত্মসাৎ করেন অসামান্য আত্মবিশ্বাসে।
পদতলে গণমাধ্যম জয়ধ্বনি গায়!

পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে। এখন আশ্চর্য লাগে।
আমার থেকে কতোটা লম্বা ছিলেন বাবা?
কতো উঁচু থেকে দেখতেন আগামী পৃথিবীকে?